কথামুখ

প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে মানুষ মুখোশ ব্যবহার করে এসেছে, নানা তাগিদে, নানা আকর্ষণে। মুখকে বিকৃত করেই মুখোশের নির্মাণ। কখনও মানুষ অন্যকে ভয় দেখাতে বীভৎস বা ভয়ংকর কোনো মুখোশ তৈরি করেছে, আবার সেই ভয়াবহ মুখোশ নিজে ধারণ করে যেন অমনই কোনো প্রবলপ্রতাপান্বিতের শক্তি আত্মস্থ করতে চেয়েছে। পৃথিবীর বহু সমাজেই দেবতারা– বিশেষত যে-দেবতারা ভয়ে-ত্রাসে-শাসানিতে সামাজিকদের তটস্থ করে সৎপথে বেঁধে রাখেন – ভয়ংকর মুখোশের রূপেই ঘরে-বাইরে-মন্দিরে পীঠস্থানে অধিষ্ঠিত থাকেন। ওই ভয়াবহতা শয়তানেরও চিহ্ন। কখনও বা নরকের দাহ-নির্যাতনে ক্লিষ্ট, ক্লেদাক্ত পাপীর মুখচ্ছবি। জার্মান কবি বেরটোল্ট্ ব্রেখ্ট্ তাঁর একটি কবিতায় বর্ণনা করেছেন পাপ-শয়তানির পরাকাষ্ঠা এমনই এক জাপানি মুখোশ – যার 'কপালের স্ফীত স্নায়ুরেখায়' তিনি ধরতে পারেন 'শয়তান হতে কাউকে কী প্রচণ্ড চাপ বহন করতে হয়!' কেউ নিজের নিজস্বকে অস্বীকার করে তাকে চাপা দিয়ে মুখের উপর মুখোশ চড়ালে তাকেও অমনই প্রবল চাপ ও যন্ত্রনা বহন করতে হয়। প্রবাদপ্রতিম মূকাভিনেতা মারসেল মারসো-র 'মুখোশঅলা' অনুনাটিকায় মুখোশঅলা হাসিমুখের মুখোশ মুখে লাগিয়ে লোক হাসাতে গিয়ে যখন সেই মুখোশের বন্ধনে বাঁধা পড়ে যায়, প্রাণপণ চেষ্টাতেও সেই মুখোশ আর খুলতে পারে না, তখন তার যন্ত্রণাকে যেন নির্মম পরিহাস করে চলে মুখোশের হাসি!

প্রত্যেক দেশ, জাতি বা সংস্কৃতিই তার নিজস্ব মুখোশশিল্পে তার একান্ত জাতিক এক পরিচয় তুলে ধরে। বাংলার মুখোশে শক্তির জেল্লাদারি বৈভব বা অলংকরণের ও বর্ণচ্ছটার দীপ্তি যতটা প্রকট, ভয়োদ্দীপক বীভৎসা ততটা নয়। ছৌ নাচে মুখোশের প্রায় দৃষ্টিহীনতার তথা ভাবাভিব্যক্তিহীনতার সম্পূরণে নর্তকের শরীরী ভাষা যেন আরো ভাবব্যঞ্জক বা অনুচ্চারিত বাঙ্ময়তায় অন্য স্ফূর্তি লাভ করে, মুখোশ তখন যেন মুখ হতে চায়!

শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়

মুখোশের জন্ম নিয়ে বিভিন্ন মত থাকলেও আদিম সমাজে মুখোশের ব্যবহার যে বহুল প্রচলিত ছিল সে বিষয়ে ভিন্নমত নেই। বহু প্রাচীন যুগ---বলা যায় প্রস্তর যুগ থেকেই পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বহু জনগোষ্ঠীর মধ্যে নৃত্যে অথবা পূজার রীতিতে মুখোশ ব্যবহারের শুরু। এরই নিদর্শন পাওয়া যায় গুহাচিত্রে---যেখানে ধনুক ধরা শিকারীর মাথাটি পশুর মতো। ভারতবর্ষে প্রাচীন বাস্তুকলায় কীর্তিমুখ ও সিংহমুখ, শিল্পে মুখোশের ব্যবহার প্রদর্শন করে। বহু সংস্কৃতিতে মুখোশ সৃজন কলা প্রকাশের পন্থা।

মুখোশ ছদ্মরূপ ধারণ করে ব্যক্তিচরিত্র রূপান্তর করার কলা। মুখোশ যে কোনো দেবতা, ব্যক্তি, পশু অথবা কাল্পনিক চরিত্রের রূপেও পরিহিত হয়। মুখোশ পরিহিত শিল্পীর নিজস্ব ব্যক্তিসত্ত্বা, চরিত্রের ব্যক্তিসত্ত্বায় মিশে যায়। মুখোশের ব্যবহার শুধুমাত্র অলংকরণের জন্য নয় বরং নৃত্যাভিনয়ের সমগ্র বাতাবরণ তৈরি করতে সাহায্য করে। দর্শককে সাধারণ জীবনযাত্রা অতিক্রম করে চরিত্রের বহুরূপী জীবনধারায় অংশগ্রহণ করতে সাহায্য করে।

অঞ্চল বিশেষে মুখোশ লোকায়ত ধর্মাচার এবং লোকনাট্যের সঙ্গে যুক্ত। প্রত্যেক অঞ্চলের নিজস্ব ধরণের মুখোশ এবং মুখোশ তৈরির পদ্ধতি আছে। মুখোশ বিভিন্ন ধরণের হয়। কাঠ, মাটি, কাগজের মণ্ড, কাপড় বা ধাতু বিভিন্ন উপাদান মুখোশ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে বর্তমান কাল পর্য্যন্ত মুখোশ শিল্প এক যোগসূত্র এবং এর ব্যবহারের পরম্পরা বিদ্যমান।

ছৌ মুখোশ

পশ্চিমবঙ্গের মুখোশনৃত্যগুলির মধ্যে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলায় অনুষ্ঠিত ছৌ নৃত্য খুবই জনপ্রিয়। এই ছৌ নৃত্য ওড়িশার ময়ূরভঞ্জ ও ঝাড়খণ্ডের সেরাইকেলাতেও প্রচলিত এবং সমাদৃত। মুখোশের ব্যবহারে ও নৃত্যশৈলীতে তিনটি স্বতন্ত্র ছৌ ঘরানা এখন স্বীকৃত। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত ছিল এইসব অঞ্চল। আনুমানিক দুশো বছর আগে বাঘমুণ্ডির ভূস্বামীদের আনুকূল্যে পুরুলিয়ায় প্রথম ছৌ নৃত্যের সূচনা হয়।

বাঘমুণ্ডি থানার চড়িদা গ্রাম ছৌ- এর মুখোশ তৈরির জন্য বিখ্যাত। চড়িদা গ্রামের বাসিন্দা শ্রী প্রশান্ত দত্তের কাছ থেকে জানা যায় যে এই গ্রামে প্রায় সত্তর ঘর সূত্রধর পরিবার এই মুখোশ শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। বর্ধমানের বেশ কিছু সূত্রধর পরিবারকে দেবদেবীর মূর্তি গড়ার কাজে নিযুক্ত করেন বাঘমুণ্ডির রাজা। রাজপরিবারের দান করা জমিতে এই সব মুখোশ শিল্পীদের বাস। বছরের যে কয়েকটি মাস – মূলত ফাল্গুন থেকে আষাঢ়-হিন্দু দেবদেবীর বিশেষ পূজা হয় না, সেই সময়ে এই সূত্রধর পরিবারগুলি মুখোশের কাজ করেন। এই সময় মুখোশের চাহিদাও থাকে প্রচুর।

চৈত্র সংক্রান্তির শিবের গাজন উৎসব তথা ভক্ত্যাপরব উপলক্ষে প্রতি বছর ছৌ নাচের সূচনা। নিজেদের গ্রামের শিবমন্দিরে বা থানে অথবা আমন্ত্রিত অনুষ্ঠানে বৈশাখ থেকে জ্যৈষ্ঠ

ছৌ মুখোশ : দুর্গা

ছৌ মুখোশ : শিব

গম্ভীরা মুখোশ : বুড়ী

গমিরা মুখোশ : শিকনিঢাল

দার্জিলিং জেলার মুখোশ